০৮-০৯-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - আবারও তোমরা এই রাজযোগের শিক্ষা গ্রহণ করছো যা স্বয়ং ভগবান আবারও তোমাদেরকে সেই পাঠই পড়াচ্ছেন। রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে তোমাদের এই পঠন-পাঠন। তাই যে যার নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সর্বদাই স্মরণে রাখবে।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, খুব উদ্যম ও উৎসাহের সাথে কিসের প্রস্তুতিতে তোমরা ব্যস্ত এখন ?

উত্তর :- তোমরা এখন খুব আনন্দের সাথে এই প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত যে, তোমাদের এই জরাজীর্ণ পুরানো শরীর ত্যাগ করলেই বাবার কাছে যেতে পারবে। তাই এই একমাত্র বাবার স্মরণে থেকেই যদি শরীর ত্যাগ করা যায় আর কোনও প্রকারের হোঁচট বা ধাক্কা খেতে না হয় - তারই অভ্যাস এখন করে যেতে হবে। শিক্ষার্থী জীবন নিশ্চন্ত জীবন। অতএব হোঁচট বা ধাক্কা খাওয়া থেকে উত্তীর্ণ হতেই হবে।

গীত :- ওহে নিশীথ রাত্রির যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে থেমে যেও না যেন, লক্ষ্যের নতুন ভোরের আলো এই ফুটলো বলে।

ওঁম্ শান্তি ! এখানে পাঠ পড়ছে ঈশ্বরীয় সন্তানেরা । শিক্ষার্থী যখন কোনও কিছু পড়াশোনা করে, একমাত্র তখনই সে জানতে পারে- কি পড়ছে সে। আর কে তা পড়াচ্ছেন - এবং সেই পাঠের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং প্রাপ্তিকেও বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারে সে। তেমনি তোমরাও এখন বুঝতে পেরেছো যে, তোমরা বি.কে.-রাই মনুষ্য থেকে দেবতা হতে যাচ্ছো। যা বর্তমানে তোমরা এখন ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ। কিন্তু কিসের পাঠ পড়ছো তোমরা ? --রাজযোগের পঠন-পাঠন। তোমারা নিজেরা এও বুঝতে পারছো যে, আবারও সেই রাজযোগের শিক্ষাই নিচ্ছো তোমরা। জাগতিক শিক্ষার্থীরা কিন্তু এমনটা বলবে না, আমরা আবার সেই পাঠই পড়ছি। কিন্তু, এখানে তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, আবারও সেই রাজযোগই শিখছো তোমরা। যা ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও তা শিখেছিলে। এই সুপ্ত জ্ঞান কেবল তোমাদের মধ্যেই আছে। স্বয়ং ভগবান এসে আবার তোমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন -যা কোনও সামান্য ব্যাপার অবশ্যই নয়। বাচ্চারা এটাও জানে যে, ভগবান মাত্র একজনই, কিন্তু ভক্তের সংখ্যা অনেক। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, শিক্ষক-বাবা কেবল একজনই আর অসংখ্য তার সন্তান। বাবাই যে বাচ্চাদের সৃষ্টিকর্তা, এ কথা সবাই স্বীকার করবে। রচনাকারই তার রচিত রচনা অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। যেমন কোনও অন্ধকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো- বাবাকে চেনার উপায় কি ? বাবা স্বয়ং তখন বলেন, "আমি যখন তোমাদের বাচ্চা বলে মেনে নিয়েছি, তখন তো তোমাদের সামনে বসতেই হবে আমাকে। আমিই তোমাদের আবার মনুষ্য থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করি। আর সেই নিমিত্তেই তোমাদের এই রাজযোগ শেখাচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে পারবে। তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতেই রাখতে হবে। তোমাদের সুপ্ত বুদ্ধিতে এও আছে যে, যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন সমগ্র বিশ্বে কেবলমাত্র একটাই রাজ্য ছিল। বাচ্চারা, তেমনি তোমরা নিজেরাও বসে চিত্র দেখিয়ে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে যে, তোমরা কি পড়াশোনা করছো। এটাই তোমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। জাগতিক স্কুলেও যখন বাচ্চারা পড়াশোনা করে, তাদের মা-বাবাও জেনে থাকে, বাচ্চারা কি পড়াশোনা করছে। আর এখানে তো তোমরা আবার রাজ্য-ভাগ্য পাওয়ার জন্য এই পাঠ পড়ছো।

অতএব, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরকেও অবশ্যই তা জানানো উচিত যে, তুমি এই গীতা-পাঠশালায় রাজযোগ শিখছো, যার ফলে তুমি রাজাদেরও রাজা হতে পারবে। এই পাঠশালাতে বৃদ্ধ-যুবক-কিশোর সবাই পড়তে পারে। যা এক আশ্চর্যের বিষয়। জাগতিক পাঠশালায় এমনটা হয় না বলেই কেবলমাত্র এই পাঠশালাকেই সৎসঙ্গ বলা যায়। যেহেতু সৎসঙ্গে তো সবাই যেতে পারে। কিন্তু সেখানকার লোকেরা এমনটা অবশ্যই বলবে না যে, তারা সেখানে গিয়ে রাজযোগ শেখে, কিম্বা স্বয়ং ভগবান তাদেরকে পড়ান। আর এখানে তো স্বয়ং ভগবান তোমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন।

এখানকার চিত্রগুলি প্রতি ঘরেই থাকা উচিত। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে কেউ আসুক না কেন, তাদেরকে এসব বোঝাতে হবে, তোমরা কিসের পাঠ পড়ছো। তাছাড়া, এই পাঠ তো খুবই সহজ-সরল। তাই এর নাম সহজ-জ্ঞান, সহজ-রাজযোগ। রাজা জনক-ও এই জ্ঞানের দ্বারাই সেকেন্ডের মধ্যেই জীবনমুক্ত হয়েছিলেন। তাই তো জগতের মানুষেরাও বলে যে, আমারও জনকের মতনই জ্ঞান চাই। কিন্তু ঘর-সংসারে গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেহেতু এই জ্ঞানের পাঠ অতি উন্নত, এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়া যায়। দেবতাদের কত উঁচু মহিমাও থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ। তাই দেবলোক হয়ে ওঠে অমরলোক। কিন্তু বর্তমানের এই দুনিয়া তো মৃত্যুলোক। যা আসুরী পতিত দুনিয়া। আর পবিত্র দুনিয়া হলো দৈবী দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ যেমন পবিত্র ছিলেন। কিন্তু এখন তো তারা আর এখানে নেই। যেহেতু এটা এখন পতিতদের রাজ্য। অতএব আবারও তোমাদের পবিত্র হতেই হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রগুলিও কত সুন্দর ! তাই লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতি লোকেদের কত শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা। আর লোকেরাও তাদের জন্য খুব সুন্দর বিশাল-বিশাল মন্দিরও বানিয়ে থাকে। অথচ কৃষ্ণের জন্য বানায় ছোট ছোট মন্দির, যেন ছোট বাচ্চাদের জন্য বানানো হচ্ছে। অথচ তারা কিন্তু আদৌ জানে না যে, এই রাধা-কৃষ্ণই পরবর্তীতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রূপ নেয়। তোমরা তাদেরকে তা বোঝাতে পারো, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারতে সেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বই ছিল। তাই সে সময়কার আর অন্য কারওরই কোনও চিত্র দেখা যায় না। সূর্যবংশী রাজবংশই সবচাইতে বিখ্যাত ছিল তখন।

লক্ষ্মী-নারায়ণ আর সীতা-রামের রাজবংশের পরে শুরু হয় দ্বাপর ও কলিযুগ। এখন সেই কলিযুগেরই অন্তিম সময় চলছে। তাই তোমরা বি.কে.-রা আবারও সেই রাজযোগের পাঠ গ্রহন করছো। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই রাজযোগ শিখেই তোমরা নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য লাভ করেছিলে। দেবতারা বরাবরই সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার থাকে। যেহেতু বর্তমানের এই দুনিয়াটা পতিত দুনিয়া, তাই স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মাকেই এখানে আসতে হয়। অবশ্য লোকেরাও পরমাত্মাকে আহ্বান করে বলে, "হে পতিত-পাবন এসো।" পরমাত্মা তো নিরাকার। আর কৃষ্ণ হলো সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। তাই সে এসে তো আর কারওকে পবিত্র বানাতে পারবে না। লোকেদের বোঝাতে হবে, সাকার দেহধারীকে কোনও ভাবেই ভগবান বলা যায় না। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও পরমাত্মাকে নিরাকার হিসাবেই মান্যতা দেয়। একমাত্র তিনিই সবার উদ্ধার-কর্তা, দিশা-নির্দেশক, পরম- সুখদাতা, ঈশ্বরীয়-পিতা, সবার দুঃখ হর্তা-সুখ কর্তা। দুঃখ হরণ করার সাথে সাথে বাবা আবার সুখের ব্যাবস্থাও করে দেন। বাচ্চারা, তোমরা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরও একথা বোঝাতে পারো। লোকেরা তো বেদ-শাস্ত্র অন্যদেরকে শোনায়। অনেক শ্রোতা মিলে একজনের থেকেই তা শোনে। এখানেও তেমনি, তোমরা সবাই মিলে এই এক বাবার থেকেই সবকিছু শুনতে থাকো। তাই তো বাবা বলেন, তোমরা

কেবল আমার কথাই শুনবে। যেহেতু এটা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরীয় বাণী, অতএব সেই নিরাকার বক্তাকে নিশ্চয় কারও শরীরকে আধার করতে হবে। একথা তো প্রচলিতই আছে, ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণদের রচনা করা হয়। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা ৫ হাজার বর্ষ পূর্বেও কল্পের এমনই সঙ্গম সময়ে ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রচনা হয়েছিল। আর পরবর্তীতে তো ব্রাহ্মণ থেকেই দেবতায় পরিণত হয়। বর্তমানের এই শূদ্র অবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ হতে পারলেই পরবর্তীতে দেবতা হতে পারবে। সেই নিমিত্তেই তো তোমরা আবারও এই রাজযোগ শিখছো এখন। যা কল্প পূর্বেও শিখেছিলে তোমরা। এভাবে বোঝাতে পারলে, অন্যেরাও ভাবতে বাধ্য হবে, এরা কিন্তু যথেষ্ট নিশ্চয়তার সাথেই এসব বলছে। স্বয়ং ভগবান যেখানে বলছেন, "তোমাদের আমি আবার রাজাদেরও রাজা, মহারাজা বানাবো।" গীতাতেও ঠিক এ ভাবেই লেখা আছে। রাজযোগ শিখেই আমরা সেই পদের অধিকারী হয়েছিলাম। এরপর দ্বাপরে শুরু হয় রাবণের রাজত্বকাল। যা এখন প্রায় শেষের মুখে। এদিকে তোমরাও আবার রাজযোগের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছো। অন্য কোনও স্কুলে কিন্তু এমনটা বলবে না, তোমরা আবারও সেই পাঠই পড়ছো। বাচ্চারা, কেবল তোমাদের বুদ্ধিই তা বুঝতে পারে। তাই বাবাও বলেন, "এই রাজযোগের পাঠ শেখাতেই আমিও আবার এসেছি এখানে তোমাদের কাছে।" যখন ঠিক এরকমই অবস্থায় মহাভারতের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, আর পান্ডবেরা সেই সময় গীতা শোনায় ব্যস্ত ছিল।

বাচ্চারা, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পাণ্ডা অর্থাৎ দিশা নির্দেশক । সেই ঈশ্বরীয় সন্তানদের উদ্দেশ্যে ভগবান স্বয়ং বলছেন : "ওহে ঈশ্বরীয় সন্তানেরা অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পাণ্ডারা, তোমরা যেন ক্লান্ত হয়ে থেমে যেও না। ভগবান তোমাদেরকে অবশ্যই গীতা শোনাবেন। তা যে স্বয়ং ভগবানের বাণী। তোমরা জানো যে, স্বর্গ-রাজ্যের সুখ পাওয়ার জন্যই তোমরা এই রাজযোগের পাঠ পড়ছো।

ভগবান তো নিরাকার। লোকেরা যখন 'শিবজয়ন্তী' পালন করে, তার মানে, পূর্বেও শিববাবা অবশ্যই কোথাও জন্ম নিয়ে কিছু না কিছু করে থাকবেন। আসলে উনি এখানে আসেন তোমাদেরকে রাজ্য-ভাগ্যের আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিতে। সত্যযুগে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যে সূর্যবংশী দেবতারাই ছিলেন। সেই রাজবংশে আরও অনেকেও থাকে। যেমন ইংরেজদের রাজবংশে এ্যডওয়ার্ড প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ..... পরম্পরায় তাদের রাজবংশ যেভাবে চলে, এটাও ঠিক তেমনই ব্যাপার। বাচ্চারা, চিত্রগুলি দেখিয়ে তোমরা আরও ভালভাবে তা বোঝাতে পারবে। ব্রহ্মা বলছেন- "আমি কিন্তু কোনও ভগবান নই। আমাকেও তো অন্য কেউ রচনা করেছেন। আমিও তো অন্যের কাছেই শিক্ষা গ্রহন করেছি। আর আমাদের এই গুরু যদি মনুষ্যই হতেন, তবে তো লাখে-লাখে ওনার সাথে আরও অনেকেই সেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকবে। যদি আরও অনেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে উনি একা তো আর এই বিশেষ শিক্ষা গ্রহন করেননি। তাই যদি হবে, তবে তারা সব কোথায় বা হারিয়ে গেল ?

আরে, আরে, বাকীরা সবাই কোথায় চলে গেল ? এখানে যে ভগবান তার বাণী শোনাচ্ছেন। উনি এসবের গুহ্য রহস্যগুলি বোঝাচ্ছেন। কি ধরণের চিত্র বানাতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের শৈশবে তারাই যে রাধা-কৃষ্ণ ছিলেন। যেখানে গীতার ভগবান স্বয়ং বলছেন, "আমিই কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। এতে প্রলয়ের কোনও ব্যাপার নেই। তোমরা নিজেরাই সুপ্ত স্মৃতির অনুভবে বলছো, তোমরা আবারও দেবতায় পরিণত হতে যাচ্ছো। 'শিবজয়ন্তী'-র কথাও উল্লেখ করা হয় শাস্ত্রে। তাই বলে তা লাখ লাখ বছর তো হতেই পারে না। বাবা তাই বসে বসে বোঝাচ্ছেন, এইসব

পুঁথি-পত্র, শাস্ত্রাদির মধ্যে কোনও সার বস্তু নেই। এগুলি পড়ে পড়ে কেবলই তোমাদের বা আত্মার গুণ ও শক্তির কলা কেবলই নিম্নগতি হয়েছে। এখন যা একেবারে গুণহীন ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছো। তাই তো বাবা বলছেন, ভক্তির শক্তিতে কেউ আমার প্রতি একাত্ম হতে পারে না। অতএব আমাকেই আসতে হয় এখানে। তোমরাই তো বলো, ভগবান কোনও না কোনও রূপে প্রত্যক্ষ হবেনই। কৃষ্ণ হচ্ছেন সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। এদিকে শিববাবা হলেন নিরাকার। সেক্ষেত্র অবশ্যই উনি কারও শরীরকে আধার বানাবেন। যেহেতু উনি পরম পবিত্র পতিত-পাবন, হিসেব মতন কলিযুগের অন্তিমেই আসবেন উনি। কৃষ্ণ দ্বাপরের এমনটাই লোকেরা বলে থাকে, যা মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাবা স্বয়ং জানান, "আমি আসি সঙ্গমে এবং ব্রহ্মার এই বুটে (জুতায়) অর্থাৎ পুরোনো শরীরেই আমি যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করি। যেহেতু অবিনাশী নাটকে কোনও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।" কিন্তু জগতের লোকেরা এসবের এতই উল্টো-পাল্টা করে রেখেছে, তাই তো ধন্দে গিয়ে তাদের মনে এতসব প্রশ্ন জাগে, গীতার প্রকৃত ভগবান কে ? তা জানা খুবই দরকার। এর উপরেই তো জগৎ-সংসারের এই অবিনাশী চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। নরকের বিনাশ আর স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা কে করেন ? -অবশ্যই তা একমাত্র এই বাবা-ই করতে পারেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের কর্ম-কর্তব্যে খুবই সক্রিয় ছিলেন। বাবা জানাচ্ছেন, কেবলমাত্র ওনাকেই স্মরণ করতে থাকলে, সেই যোগ অগ্নিতেই বিকর্মগুলি বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু সবাই তা বুঝতে পারবে না। কারও যেমন বেশ ভালই লাগে, কিন্তু পবিত্র থাকার সৎ-সাহস তার থাকে না। দেবী-দেবতা ধর্মের চারাগাছের রোপণ চলছে এখন। গত কল্পে যারা যারা ব্রাহ্মণ হয়েছিল, এবারও তারাই হবে। এই কলমের চারাগাছ একমাত্র বাবা ভিন্ন অন্য কেউ রোপন করতেই পারে না। যারা দেবতা-বর্ণে আসতে আগ্রহী, তাদের নিজেকে অবশ্যই প্রথমে শূদ্র-বর্ণ থেকে ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ হতেই হবে। অন্যথায় দেবতা হবে কি প্রকারে ? বিরাট রূপকেও খুব বিস্তারে বোঝাতে হবে। একেবারে শিখরের চূড়ায় শিবকেই দেখানো হয়। জগতের লোকেরা তো শিবকে আর ব্রাহ্মণ-বর্ণকে বাদ দিয়েই রেখেছে, কেবলমাত্র দেবতাদের আর ক্ষত্রিয়দেরকেই দেখায় তারা। বিরাট রূপকেও তারা আবার বিষ্ণুর রূপেই দেখায়। এইসব জ্ঞানকে যথেষ্ট বোঝার ব্যাপার আছে। মানুষ কিভাবে ৮৪ জন্মের চক্রে ঘুরে-ফিরে আসে, ইত্যাদি। অন্যেরা এইসব জ্ঞানের কথা তো জানেই না। তাই বাবা জানাচ্ছেন, পরে এইসব জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়-পরম্পরায় তা চলতে থাকে না। স্ব-দর্শণ চক্র দেবতাদের জন্য নয়, যা কেবল বি.কে. ব্রাহ্মণদের জন্য। কিন্তু তোমরা তো এখনও সম্পূর্ণ হতে পারনি যে, তাই সেই চিহ্ন-স্বরূপ গুলিকে দেবতাদের মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়। নিজেরা নিজেদের স্ব-দর্শণ চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে, পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র হয়ে, জ্ঞানের শঙ্খ-ধ্বনি করতে করতে তোমরাও দেবতায় পরিণত হয়ে যাবে। শিববাবা এই ব্রহ্মার দ্বারাই বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করাচ্ছেন। যা সাধারণ কারও বুদ্ধিতেই তা আসে না। স্বয়ং ভগবান যেখানে তোমাদের এই পাঠ পড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানান, সেখানে তোমাদের কতই না খুশীতে থাকা উচিত। ছাত্র-জীবনই শ্রেষ্ট-জীবন। শিক্ষার্থীর এই জীবন বাধাহীন মুক্ত-জীবন। এরপর তো মানুষদের বিছানো জালে ফাঁসতেই হবে। যে জাল কেবল দুঃখ-কষ্টের। সত্যযুগে এসব কোনও ব্যাপারই নেই। আত্মারা তাদের ইচ্ছানুসারে আনন্দের সাথেই দেহ ত্যাগ করে। গুমড়ে-গুমড়ে মরা, তা কেবল এই রাবণ রাজ্যেই। তোমরা খুব আনন্দ সহাকারে নিজেদের প্রস্তুত করছো, কবে তোমরা বাবার কাছে যেতে পারবে এই ভেবে। সেই উদ্দেশ্যেই তো তোমরা এখানে বসে আছো এখন। এই পুরোনো শরীর ত্যাগ করার পর, পরবর্তী ২১ জন্ম আর হোঁচট-ধাক্কা খাবার প্রশ্নই নেই। আর এই জন্মেও মোটেই আর হোঁচট-ধাক্কা খেয়ো না যেন, যেহেতু তোমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হতে যাচ্ছো। অতএব অপার খুশীতে থাকতে হবে।

আচ্ছা, এটাও খুব ভাল যে, এখানে বসেই সূক্ষ্মবতনে পৌঁছে যেতে পারো। তোমাদের ফরিস্তা হতে হবে যে। অর্দ্ধ-কল্প ধরে তো কেবল হোঁচট আর ধাক্কা খেয়েই এসেছো। তাই তোমরা এখন খুব খুশীর সাথেই তৈরী হচ্ছো বাবার কাছে যাবার জন্য। অতএব আর যেনএইসব হোঁচট বা ধাক্কা খেতে না হয়, নিজেকে সেভাবেই তৈরী করতে হবে। এমনও অনেক সন্ন্যাসী থাকে, যাদের আত্মা বসে বসেই শরীর ছেড়ে দেয় আর আশেপাশে একটা স্তব্ধতা বিরাজ করে। তখন অন্যরা ভাবে যে, তার আত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেছে। কেউই যেতে পারবে না দুনিয়ার এই তত্ত্বের গন্ডি ছেড়ে, যতক্ষণ না বাবা নিজে এই দুনিয়ায় আসবেন। শিববাবার ভাণ্ডার তো সর্বদাই পরিপূর্ণ। প্রবাদই তো আছে, যে ভাণ্ডারা থেকে আমরা খাবার খাই, তা খাওয়া মাত্রই ব্যাথা-বেদনা সব দূর হয়ে যায়। এখানে তো অকালে মৃত্যু হতেই থাকে। পতিত-পাবন শিববাবার ভাণ্ডারাতে যে আসে ও খায়, সে পবিত্র হয়ে যায়। সে কারণেই তাকে ব্রহ্মাভোজন বলা হয়। খুবই মাহাত্ব্য এর। এর জন্য অবশ্য খুব ভাল যোগী হওয়ারও দরকার। যোগযুক্ত হয়ে ভোজন তৈরী করলে এবং তা খেলে, তোমাদেরও অনেক উন্নতি হবে। যোগযুক্ত ভোজনে খুব শক্তিও থাকে। যোগযুক্ত হয়ে ভোজন গ্রহণ করলে তোমার যেমন শক্তি বৃদ্ধি হবে তেমনি সুস্থও থাকতে পারবে। ব্রহ্মাবাবা নিজেও তা বলেন যে, " আমি যেভাবে বাবার স্মরণে বসে ভোজন করি- মনে হয় যেন, আমি আর বাবা একসাথে বসে ভোজন করছি। কিন্তু, তবুও কখনও কখনও ভুলেও যাই। একমাত্র বাবার স্মরণে থেকেই যেন শরীর ত্যাগ করতে পারি, আর কোনও হোঁচট বা বাধা যেন না আসে, তোমাদেরও সেই অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে পারলে প্রথমতঃ শান্তি পাওয়া যায় আর স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। ভোজনও পবিত্র হয়ে যাবে। অন্তিম সময়ের জন্যও তো প্রবাদ আছে, অতিন্দ্রিয় সুখ কাকে বলে, গোপ-গোপিনীদের কাছ থেকে তা জেনে নাও। কল্প-বৃক্ষ চিত্রের এই ঝাড়কে খুব ভালভাবে বুঝতে হবে ও বোঝাতেও হবে। ত্রিমূর্তি আর গোলা অর্থাৎ সৃষ্টি-চক্রও বোঝাবার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এভাবেই দিন-প্রতিদিন তোমার নাম খুব উজ্জ্বল হতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তাঁর ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সদা সুস্থ থাকার জন্য, যোগযুক্ত হয়ে ভোজন সামগ্রী তৈরী করতে হবে এবং সেভাবেই যোগযুক্ত হয়ে তা গ্রহণও করতে হবে। আহার করার সময় স্মৃতিতে যেন থাকে যে, বাবার সাথে একত্রে বসেই আমি অন্ন গ্রহণ করছি - তবে সেই ভোজন শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

২) দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে জ্ঞানের শঙ্খ-ধ্বনি করতে হবে। স্ব-দর্শণ চক্রকে সর্বদাই ঘোরাতে হবে। পদ্ম-ফুলের মতন নিজের জীবনকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদান :- অপরকে পরিবর্তন করার চিন্তা ছেড়ে নিজেকে পরিবর্তন করার শুভ চিন্তক আত্মা হও

বিস্তার :- নিজেকে পরিবর্তন করা মানেই শুভ চিন্তক হওয়া। যদি নিজেকে ভুলে থেকে, অপরকে পরিবর্তনের চিন্তা করো, তবে তা শুভ চিন্তা নয়। সর্বাগ্রে নিজেকে, তারপর নিজের সাথে অন্য

সবাইকে। যদি নিজেকেই পরিবর্তন করতে না পারো, অথচ অন্যের শুভ-চিন্তক হও, তাতে কিন্তু কোনও সফলতা পাওয়া যাবে না। অতএব বিধি অনুসারে যদি নিজেকে পরিবর্তন করো, তবেই তা ফলপ্রসু হবে। যদিও বাইরে থেকে তার কোনও লক্ষ্যণ দেখতে নাও পাও, নিজের মনের ভিতরে হাল্কাভাব আর খুশীর অনুভূতি হবে।

স্লোগান :- সেবার প্রতি সর্বদা উৎসাহ উদ্যম থাকলে ছোট ছোট অসুখ-বিসুখ তাতেই দূর হয়ে যায়।